বণিক বার্তা
শুক্রবার, জানুয়ারি ২৪, ২০২৫ • মাঘ ১০, ১৪৩১

বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : সংকট ও সম্ভাবনা

অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সালাম

নব্বইয়ের দশকে দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ছিল অতি সীমিত। হাতেগোনা কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দেশের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে এ শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষাপ্রত্যাশীদের একটি বড় অংশ তখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতসহ ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে নিজ অর্থায়নে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশে যেত। এর মাধ্যমে একদিকে মেধা পাচার হচ্ছিল, অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশের বাইরে চলে যাচ্ছিল। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রত্যাশীদের নিজ অর্থায়নে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে ১৯৯২ সালে একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়া হয়। সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৭। উচ্চ শিক্ষা খাতে এসব বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে যেমন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে, তেমনি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সংকটও রয়েছে।

প্রথম দিকে যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের শিক্ষার মান আশাব্যঞ্জক ছিল। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের প্রচেষ্টা, গবেষণায় গুরুত্বারোপসহ বেশকিছু ইতিবাচক দিক দেখতে পেয়েছিলাম। তবে সময়ের সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন বেড়েছে। মাত্র তিন দশকে ১১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক সংকটসহ সুযোগ-সুবিধার সংকট রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় যেসব গ্র্যাজুয়েট তৈরি করছে তাদের বেশির ভাগের মধ্যে শিখন ঘাটতি থেকে যাচ্ছে এবং কর্মবাজারে সাফল্যের দেখা পাচ্ছে না। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে এ শিখন ঘাটতি অন্যতম কারণ।

আমরা যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন দশক বিবেচনা করি, তাহলে মোটাদাগে এখানে তিন ধরনের সংকট রয়েছে। প্রথমত, ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বন্দ্ব। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ট্রাস্টি বোর্ড। শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ, সিলেবাস নির্ধারণ থেকে শুরু করে প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই ট্রাস্টি বোর্ড গ্রহণ করে। কিন্তু বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডে দ্বন্দ্ব রয়েছে। আমরা বিভিন্ন স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও দেখেছি ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বন্দ্বের কারণে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে, শিক্ষার্থীরা নানা ভোগান্তির শিকার হয়েছে। এমনকি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা বিপুল পরিমাণ আর্থিক কেলেঙ্কারিতেও জড়িয়েছেন। ট্রাস্টি বোর্ডে এ ধরনের দ্বন্দ্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক কার্যক্রমে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সংকটটি হলো শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও মানসম্মত কারিকুলামের অভাব। মানসম্মত উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ। দেশের হাতেগোনা কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েরই উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ নেই। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, ল্যাব নেই, লাইব্রেরি নেই, নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। এমনকি এমনও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যারা কোনোমতে একটি ভাড়া ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং বিভাগগুলো চলছে শুধু দু-একজন লেকচারার দিয়ে। এ ধরনের পরিবেশে কখনো মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এছাড়া উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মবাজার বিবেচনা করে উপযুক্ত ও সময়োপযোগী কারিকুলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই সময়োপযোগী কারিকুলাম নেই। আবার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম আধুনিকায়ন করা হলেও দক্ষ শিক্ষক ও ল্যাবের অভাবে কারিকুলামের প্রয়োগ নেই। ফলে যেসব শিক্ষার্থী এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পড়ছেন তারা সময়োপযোগী শিক্ষা পাচ্ছেন না, তাদের মেধার সঠিক ব্যবহার ও বিকাশের সুযোগ পাচ্ছেন না।

ছবি : মাসফিকুর সোহান

এ দুটি সংকট ছাড়া আরেকটি বড় সংকট হলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার প্রচেষ্টা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এখন শুধু উচ্চবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরাই পড়ালেখা করছে না। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মেধাবী সন্তানরাও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। এমনকি এমনও পরিবার রয়েছে, যারা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিতে নিজেদের জমি বিক্রি করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই অতিরিক্ত ফি গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি এটি স্বাভাবিক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অস্বাভাবিক ফি আদায় করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত ব্যয়ের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অর্থ আদায় করে লাভজনক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এ প্রবণতা রোধ করা না গেলে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীই অর্থের অভাবে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।

তবে এসব সংকটের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সাফল্য ও সম্ভাবনাও রয়েছে। গত কয়েক বছরে আমরা গবেষণা খাতে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অবদান দেখতে পেয়েছি। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়েও এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দ্রুত উন্নতি করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রেখে প্রশংসিত হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী শিক্ষার্থী আকৃষ্ট করতেও সক্ষম হয়েছে। ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ১১৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে তিন লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। এদের মধ্যে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৬০০ এবং দেশে অধ্যয়নরত বিদেশী শিক্ষার্থীদের ৭০ শতাংশই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। এসব শিক্ষার্থীর মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আসছে, যা অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

এছাড়া রাষ্ট্র সংস্কারেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একসময় রাষ্ট্র সংস্কারের আন্দোলন-সংগ্রামগুলোয় আমরা শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ দেখতাম। কিন্তু গত কয়েক বছরে আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও এসব ক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ দেখতে পাচ্ছি। সর্বশেষ জুলাই আন্দোলনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। অর্থাৎ শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সংস্কারসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং সাফল্যও অর্জন করছে।

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বর্তমানে যে সংকটগুলো রয়েছে, সেগুলো দূর করতে পারলে এ সাফল্য দ্রুতই আরো বাড়বে। সংকটগুলো দূর করাও কঠিনতর কোনো বিষয় নয়। সুপরিকল্পিতভাবে কয়েকটি বিষয়ে কাজ করলেই বেশির ভাগ সংকট দূর করা সম্ভব। এর মধ্যে একটি হলো প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় সব সংকটের সঙ্গেই এ রাজনৈতিক প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১১৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় অংশই শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত না করেও রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদন পেয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডও রাজনৈতিক বিবেচনায় গঠিত হয়েছে এবং এ রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই ট্রাস্টি বোর্ডে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব হচ্ছে। এছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নানা অনিয়ম-দুর্নীতিও সংগঠিত হলেও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে পার পেয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে পারি, ট্রাস্টি বোর্ডে এমন ব্যক্তিদের রাখতে পারি যারা প্রকৃতপক্ষেই শিক্ষা অনুরাগী ও দল মতের ঊর্ধ্বে গিয়ে শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা করেন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনিটরিং ও ব্যবস্থা গ্রহণ। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতে ১৯৯২ সালের আইন সংশোধন করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে নিজস্ব ক্যাম্পাসসহ বেশকিছু বিষয়ে বাধ্যবাধকতা দেয়া হয়েছে। এ আইনের কারণে এরই মধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণ করেছে। এক্ষেত্রে আরো কঠোর ভূমিকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সময়োপযোগী কারিকুলাম, পর্যাপ্ত শিক্ষক, ল্যাব, পাঠাগারসহ শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবে, শুধু তাদেরই শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেয়া উচিত। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি সময়োপযোগী কারিকুলাম ও উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত না করে শিক্ষা কার্যক্রম চালায়, তবে অদক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরি হবে এবং দেশের উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আরো বাড়বে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফি নির্ধারণ ও আর্থিক বিষয়গুলো মনিটরিংয়ে আরো জোর দেয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফি যেন দেশের মানুষের আর্থিক সংগতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়। এটিও নিশ্চিত করতে হবে এ বিষয়গুলো যেন শুধু আইনেই সীমাবদ্ধ না থাকে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যদি এসব শর্ত পূরণ ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত না করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বর্তমান বিশ্ব অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। শ্রমবাজারে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চাহিদা তৈরি হচ্ছে। প্রতিনিয়ত সৃষ্ট এ নতুন চাহিদা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি বড় সুযোগ হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের পাঠক্রম সাজালে সহজেই শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারবে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য দক্ষ কর্মী নিশ্চিত করতে পারবে। এছাড়া গত কয়েক বছরে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়ার সংযোগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। দেশের বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান যুক্ত রয়েছে। ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়ার সংযোগ স্থাপন তুলনামূলক সহজ। প্রতিষ্ঠানগুলো এ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলে শিক্ষা-গবেষণায় এগিয়ে যেতে পারবে এবং দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে সক্ষম হবে। বিশ্বে স্বনামধন্য প্রথম সারির যেসব বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তাদের বড় অংশই বেসরকারি। আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও এমন অবস্থানে পৌঁছানো অসম্ভব নয়। পর্যাপ্ত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা থাকলে আমাদের দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এমন অবস্থানে পৌঁছবে বলে আমি আশাবাদী।

লেখক : অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা ও গুণগত মানকে গুরুত্ব দিচ্ছে উত্তরা ইউনিভার্সিটি

অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন আরা লেখা

উপাচার্য, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়

সা ক্ষা ৎ কা র

সময়ের চাহিদায় গবেষণাকে আমরা এখন অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। বর্তমানে আমরা 'উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় উৎকর্ষ'—এ স্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। গবেষণাকে উৎসাহিত করতে শিক্ষকদের রিওয়ার্ডের ব্যবস্থাও রেখেছি

আমাদের শিক্ষা খাতকে ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? বিশেষত উচ্চ শিক্ষাকে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ শিক্ষা খাতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করেছে। এ সময়ে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের একটি ইতিবাচক চিত্র পাওয়া যায়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয়ে উন্নতি হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষায় আমরা এখনো কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছতে পারিনি। ২০২৫ সালে এসে বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, আন্তর্জাতিক মানের সিলেবাস ও পাঠদানের ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে গবেষণার ক্ষেত্রে সব বিশ্ববিদ্যালয় সমানতালে এগোতে পারছে না। এরই মধ্যে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে গবেষণায় ব্যাপক কাজ করছে। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণার পরিমাণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও মান বৃদ্ধির জন্য যে কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন, তা এখনো পর্যাপ্তভাবে হয়নি। তবে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় এসব লক্ষ্য অনেকাংশে পূরণ করতে পেরেছে। আমাদের আগের স্লোগান ছিল 'সাশ্রয়ী টিউশন ফিতে মানসম্পন্ন শিক্ষা'। আর এ সাশ্রয়ী ফিতেই প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষার্থী এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজেদের শিক্ষাজীবন শেষ করেছে।

সময়ের চাহিদায় গবেষণাকে আমরা এখন অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। সেই জায়গায় কাজ করার জন্য আমরা বর্তমানে 'উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় উৎকর্ষ'—এ স্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা গবেষণাকে উৎসাহিত করতে শিক্ষকদের রিওয়ার্ড দেয়ার ব্যবস্থাও রেখেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মানসম্মত শিক্ষক নিশ্চিতকরণে কী করণীয়?

মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবান্ধব। এখানে শিক্ষার্থীরা সহজেই শিক্ষকের কাছে যেতে পারে, শিক্ষকরা সহজেই ম্যানেজমেন্টের কাছে আসতে পারেন। আমাদের টিম স্পিরিটটা অনেক ভালো, যার ফলে যেকোনো কাজে হাত দিলে সফলতা আসছে। অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এদিক দিয়ে আমরা বিশেষত্ব দাবি করতে পারি। সম্প্রতি বিদেশী ডিগ্রিধারী অনেক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে, তারা গবেষণার কাজও করছেন। শিক্ষক নিয়োগের পর নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান থাকে। পাশাপাশি শিক্ষকদের জন্য আন্তর্জাতিক কর্মশালা, সেমিনার ও গবেষণা সহযোগিতা প্রদান করা হয় যাতে তারা বৈশ্বিক মানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন।

ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের বিষয়ে আপনারা কী ভাবছেন?

ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন বর্তমানে অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষার্থীদের একাডেমিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতায় রূপান্তর করতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এরই মধ্যে এ বিষয়ে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংয়ের সুযোগ তৈরি করেছে। আমাদের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স অফিস শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ ও জব করার সুযোগ করে দেয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়মিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

সম্প্রতি আমরা এইচআর সামিট আয়োজন করেছি, যেখানে বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের এইচআররা অংশগ্রহণ করেছেন। ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে সরাসরি সংযোগের মাধ্যমে আমরা ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা জেনে কারিকুলাম ডেভেলপের চেষ্টা করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ব্যাপ্তি ও মান উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি আগ্রহের ঘাটতির কথাটিও শোনা যাচ্ছে। এটা কতটা সত্য?

গবেষণার মানোন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হলেও আগ্রহের ঘাটতিও সমানভাবে প্রভাব ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণায় আগ্রহ কম থাকার মূল কারণ গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব। তবে আমাদের প্রতিষ্ঠানে গবেষণাকে উৎসাহিত করতে অভ্যন্তরীণ গবেষণা তহবিল গঠন, মানসম্মত গবেষণার জন্য ইনসেনটিভ প্রদান ও গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশে সহায়তা করা হচ্ছে। উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষার্থী চাকরির বাজারে রয়েছে। এখন তারা কর্মক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষমতার পরিচয় রাখছে। সরকারি চাকরি, মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের শিক্ষার্থী রয়েছে। আমাদের প্রচুর শিক্ষার্থী উদ্যোক্তা হিসেবেও সমাজকে সেবা দিচ্ছে। আমি মনে করি, এটা আমাদের অনেক বড় অর্জন।

যেসব প্যারামিটার বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে ভালো অবস্থান তৈরিতে ভূমিকা রাখে সেগুলোয় আপনারা কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন?

বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে ভালো অবস্থান অর্জন করা মানে শুধু গৌরবের নয়, বরং এটা শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়নকেও নির্দেশ করে। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে ভালো অবস্থান পেতে নির্দিষ্ট কিছু প্যারামিটারে কাজ করা প্রয়োজন, যেমন গবেষণা প্রকাশনা, ইন্টারন্যাশনালাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ ও সামাজিক প্রভাব। আমরা এ বিষয়গুলোয় গুরুত্ব দিচ্ছি এবং নিয়মিতভাবে কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছি। নতুন ক্যাম্পাসে আসার পর অত্যাধুনিক ক্লাসরুম ও ল্যাব সুবিধা, আন্তর্জাতিক মানের বিশাল সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য মাল্টিপারপাস হল, খেলাধুলার জন্য মাঠ, সেমিনার-ট্রেনিং-প্রোগ্রাম-খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য যা দরকার, সবই পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। মানসম্মত ক্যান্টিনে সুলভে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য।

এছাড়া ২০২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংস ফর ইনোভেশনে (ডব্লিউইউআরআই) স্থান পেয়েছে। এ র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের ৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ২৭৬তম। রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনটি ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছে উত্তরা ইউনিভার্সিটি। বিশ্বের শীর্ষ ১০০ ইউনিভার্সিটির মধ্যে উরি র‍্যাংকিংয়ে স্টুডেন্ট সাপোর্ট অ্যান্ড এনগেজমেন্ট ওয়ার্ল্ড ক্যাটাগরিতে ১২তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের উত্তরা ইউনিভার্সিটি। এই ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের মধ্যে উত্তরা ইউনিভার্সিটির অবস্থান প্রথম। উরি র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ ১০০ ইউনিভার্সিটির মধ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও টেকনোলজি ক্যাটাগরিতে উত্তরা ইউনিভার্সিটি আছে ২২তম অবস্থানে।

বৈশ্বিক বাজারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েট প্রফেশনালদের কোনো ইতিবাচক ব্র্যান্ড তৈরি হয়নি। আপনি কী ভাবছেন এ বিষয়ে?

পড়াশোনার পাশাপাশি এখানে খেলাধুলা, ডিবেট, সামাজিক কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও জোর দেয়া হয়। আমাদের একটি হিউম্যানিটিজ ল্যাব আছে, যেখানে গেলে যেকোনো মানুষের মন ভালো হয়ে যাবে অল্প সময়েই। এছাড়া ফুল টাইম কাউন্সেলিং করার জন্য কাউন্সিলর ও টিম আছেন, যারা শিক্ষার্থীদের সাপোর্ট দিয়ে থাকেন। বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েটরা ব্র্যান্ড হিসেবে তৈরি হতে পারেনি—বিষয়টি সম্পূর্ণ সত্য নয়। এরই মধ্যে আমাদের অনেক গ্র্যাজুয়েট আন্তর্জাতিক খ্যাতিমানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে সফলতার সঙ্গে কাজ করছে। তবে বৈশ্বিক বাজারে যে হারে জব পাওয়ার কথা সে সংখ্যাটা তুলনামূলক কম। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক কোর্স চালু করা হয়েছে ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে নিয়মিত কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে।

টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের উন্নয়নে গবেষণা কাউন্সিল দরকার

অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার আইয়ুব নবী খান

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি)

সা ক্ষা ৎ কা র

যেহেতু এটি কারিগরি ও ফ্যাশন সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয় সেহেতু এমন ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শিল্প মালিকদেরও এগিয়ে আসা উচিত

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পার করে দেশের উচ্চ শিক্ষা খাতকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

শিক্ষা খাত নিয়ে জাতির যে আকাঙ্ক্ষা তা পূরণ হয়নি। একেবারেই যে সফল হয়নি সেটিও বলা যাবে না। দেশের তরুণদের মাঝে উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। সরকারি পর্যায়ে ৫৩-এর অধিক এবং বেসরকারি পর্যায়ে শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এতে বোঝা যায় শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। এছাড়া যুগোপযোগী নতুন নতুন বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যুক্ত হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে পারি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। তবে প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্জন হয়নি। কোয়ালিটি এডুকেশন, শিল্প বেজড কারিকুলাম আমাদের দেশে নিশ্চিত করতে পারিনি। আমি আশাবাদী সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চলমান প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব। শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা এবং জাতি গঠনে শক্তিশালী ভিত্তি রচনায় আমরা যারা শিক্ষক সমাজ তারা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছি। সমাজের শিক্ষিত অংশকেও এ বিষয়ে নজর দিতে হবে।

শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা মনে করেন দেশের প্রাইমারি থেকে উচ্চ শিক্ষা সব পর্যায়েই কোয়ালিটি শিক্ষকের সংকট রয়েছে। বিষয়টিকে কতটা যথাযথ মনে করেন? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মানসম্মত শিক্ষক নিশ্চিতে করণীয় কী?

এটা সত্য যে আমরা মানসম্মত শিক্ষক পাই না। গ্র্যাজুয়েশনের পরেই শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা উচিত; বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে। অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের নতুন শিক্ষকদের একটি ফাউন্ডেশন ট্রেনিংয়ের দরকার আছে বলে আমি মনে করি। যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য দেশে এক বছরের কোর্স করা না থাকলে কেউ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান না। শিক্ষকতার গুণাবলি অর্জনের জন্য একটি ফাউন্ডেশন কোর্স প্রচলন করা দরকার। বিইউএফটি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার ও ইউজিসি নির্ধারিত নির্দেশনাগুলোর সঙ্গে আপস করে না। নির্দেশনা অনুযায়ী ধাপে ধাপে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। নিয়োগের শর্ত পূরণ, লিখিত পরীক্ষা, ডেমো ক্লাস, সর্বশেষ ভাইভার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক ফাউন্ডেশন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নেই সেহেতু যোগদানের আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়।

গত কয়েক বছর ধরে জোরদারভাবে উঠে আসছে ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের আলাপ। বলা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্টের কথা। এ বিষয়ে আপনারা কী ভাবছেন?

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ কোলাবোরেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২ সালে বিইউএফটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ বিষয়ে আমরা জোর দিচ্ছি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ২১ সদস্যের সবাই গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের স্বত্বাধিকারী। তাদের ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী কারিকুলাম সাজাই এবং শিক্ষার্থীদের অবহিত করি। আবার যেহেতু এটি কারিগরি ও ফ্যাশন সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয় সেহেতু এমন ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শিল্প মালিকদেরও এগিয়ে আসা উচিত। এতে উইন-উইন সিচুয়েশন তৈরি হবে। আমাদের দেশে গার্মেন্ট সেক্টরে পার্শ্ববর্তী দেশের অনেক দক্ষ জনবল কাজ করেন। যদি এ কোলাবোরেশন তৈরি করা যায় তাহলে আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা তাদের স্থানগুলোয় সুযোগ পাবেন। বিদেশনির্ভরতা কমবে। সেজন্য প্রতিটি কারিকুলামে ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম নিশ্চিত করি। ফলে আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের চাকরির সুযোগের হার প্রায় ৯০ শতাংশের ওপরে। একাডেমিয়া, ইন্ডাস্ট্রি, গভর্নমেন্ট কোলাবোরেশন যা ট্রি-হেলিক্স মডেল নামে বেশি পরিচিত, এতে গুরুত্বারোপ করা জরুরি। এরই মধ্যে আমরা ১৪টি প্রথিতযশা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণা চুক্তি করেছি।

বিইউএফটি থেকে হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট বের হয়েছেন। তার পরও এখনো গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষ পর্যায়ে বিদেশীরা। বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কতটুকু অর্জন হয়েছে?

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ১২-১৩ বছর, যেটি একটি ইনস্টিটিউট দিয়ে শুরু হয়েছিল। সেই হিসেবে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২৪ বছর ধরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদের চাহিদা মেটাতে কাজ করে যাচ্ছে। এ অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের বেশকিছু গ্র্যাজুয়েট ভালো ভালো পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। সিইও পর্যায়েও পৌঁছে গেছেন। কেউ কেউ উদ্যোক্তা হয়েছেন। ক্লাসিক হ্যান্ডমেইড প্রডাক্টসের ওপর জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি আমাদেরই শিক্ষার্থী। এইচঅ্যান্ডএম, লেভাইস, পুমাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ে কাজ করছে। মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার কোম্পানির কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ বিইউএফটির সফল গ্র্যাজুয়েট। শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। আগে যে পরিমাণ বিদেশী কাজ করতেন এখন অনেক কমে গেছে। আমরা মনে করি, আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। পাঁচ বছরের মধ্যে বিদেশীদের স্থান দখল করা কঠিন হবে না বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গবেষণার ব্যাপ্তি ও মানোন্নয়নে অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি আগ্রহের ঘাটতির কথাটিও শোনা যাচ্ছে। এটা কতটা সত্য? এ পরিস্থিতি বদলাতে আপনারা কতটুকু জোর দিচ্ছেন?

আসলে আমাদের দেশে গবেষণার কালচার দেখা যায় না। তবে একেবারে যে নেই তা না। সীমিত পরিসরে শুরু করেছি। আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা গবেষণায় আগ্রহী হন। কেননা পোশাক শিল্প খাতে গবেষণার হার খুবই কম। আমরা মনে করি, আমাদের যে শিক্ষার্থীরা আছেন, তারাই এ জায়গাগুলোয় নেতৃত্ব দেবেন। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনা শিল্প মালিকদের পথ দেখাতে পারবে। গবেষণা না হলে আমাদের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়বে। পণ্যের বৈচিত্র্যায়নের জন্য গবেষণা প্রয়োজন। এরই মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের সার্বিক উন্নয়নে জাতীয়ভাবে একটি গবেষণা কাউন্সিল করা দরকার।

বিশ্বের বিভিন্ন র‍্যাংকিংয়ের বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক পিছিয়ে। র‍্যাংকিংয়ে বিইউএফটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আপনাদের পরিকল্পনা কী?

এটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা এখনো ওই পর্যায়ে যেতে পারিনি। র‍্যাংকিং অনেকগুলো মাপকাঠির ওপর বিচার করা হয়। আমাদের এখানে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক সংকট রয়েছে। তা কাটানোর চেষ্টা করছি। তাই আমরা পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানোয় জোর দিচ্ছি। আমাদের ইমপ্লয়াবিলিটি রেট ঠিক আছে। গবেষণার দিকে নজর দেয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে দুই-তিন বছরে পাঁচ শতাধিক আর্টিকেল ভালো মানের জার্নালে প্রকাশ করা হয়েছে। বিদেশে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ফলে আশা করি আমাদের র‍্যাংকিংয়ে প্রভাব পড়বে। তবে এর আগে আমরা র‍্যাংকিংয়ে খুব নজর দিইনি। এজন্য আমরা সম্প্রতি সেদিকে নজর দিয়েছি। তবে এটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের। বলামাত্রই তো হবে না। কিছুদিন হয়তো সময় লাগবে। তবে একটি কথা বলতেই হয়, এরই মধ্যে আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য দেখাচ্ছেন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোয় নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে স্থান করে নিয়েছেন। তবে নিকট ভবিষ্যতে আমরা আরো ভালো করতে পারব বলে নিশ্চিত করে বলতে পারি।

শ্রুতলিখন : **আনিসুর রহমান**